চাঁদের অমাবস্যা :
আরেফ আলির অভিযাত্রা

মানবেন্দু রায়

দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।

তুমি বল, যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহার অপকারিতা হইতে ও প্রথম রজনীর অন্ধকার যখন বিকীর্ণ হয় সেই অন্ধকারের অপকারিতা হইতে এবং গ্রন্থি মধ্যে কুহককারিনী নারীদিকের অপকারিতা হইতে এবং যখন বিদ্বেষ করে বিদ্বেষকারীর অপকারিতা হইতে আমি প্রাতঃকালের প্রতিপালকের নিকটে আশ্রয় লইতেছি।

সূর ফলক : কোরআন শরীফ/ অনুবাদ— গিরিশচন্দ্র সেন।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং গদ্যশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ের জীবন বৃত্তান্তে আমরা কয়েকটি মিল লক্ষ্য করলে, আশ্চর্য হতে পারি। দুই স্রষ্টার জীবনবৃত্ত ঊনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে পূর্ণ হয়। দু'জনকে কর্মচক্রে প্রবাসী হ'তে হয়েছিল এবং দুজনের রচিত সাহিত্যে সৃষ্ট - চরিত্রসমূহ নিয়তিতাড়িত। চরিত্রগুলির সংকটের প্রাতিস্বিকতা প্রায়ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গণ্ডিটিকে অতিক্রম করে একটি বহুস্তর বিশিষ্ট সময়রেখাকে স্পর্শ করেছে। ফলে তাঁদের সৃষ্টকাহিনী - পরম্পরা যেমন একটি সামাজিক অনুবর্তনকে স্পষ্ট করে তোলে, অনুরূপভাবে সৃজিত - সাহিত্যের রচনা সৌকর্য্য এবং পরিণতি মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় কাহিনী-আবহকে সমকালের দর্পণে প্রতিফলিত করে। ভারতীয় মহাকাব্য 'রামায়ণ'— মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্যের বীজাধার— রাময়ণের খণ্ড-কাহিনীকে বিশ্ব - মহাকাব্য সমূহের নির্যাসে নিষিক্ত করে ঊনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী কালভূমিতে ব্যক্তি - সংকটের আধারের বহুমাত্রায় অম্বিত করেছিলেন বাঙালী মহাকবি। সেই সাহিত্যের রসায়ন তাঁর নিজের জীবনতৃষ্ণার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের নায়ক রাবণের আর্তস্বর, কখন যেন মধুসূদনের ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছিলো। স্রষ্টার আত্মস্থ বিষাদ, সৃষ্ট চরিত্রটির মনের আকাশকে ঢাকা দিয়েছিলো ! এ প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা প্রয়োজন, ইউরোপীয় সংস্কৃতির এবং সভ্যতার প্রতি মধুসূদন দত্তের সুতীব্র আশ্লেষ, কী ভাবে তার জীবনযাপনের স্তরগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলো। বিদেশমুগ্ধতার চোরাস্রোত তাঁর জীবনকে কেমনভাবে বিড়ম্বিত করে তুলেছিল এবং শেষ অবধি তিনি আত্মত্রাণ খুঁজে নিয়েছিলেন, মাতৃভাষা চর্চার অবিনাশী আয়োজনের ভিতরে।

অনুরূপভাবে ওয়ালীউল্লাহের ব্যক্তিগত জীবনের একটা বড় অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেটেছে প্রবাসে। তাঁর জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর পার হয় অবিভক্ত বঙ্গদেশের নোয়াখালিতে এবং কলকাতায়। পিতার কর্মসূত্রে তাঁর বাল্যকাল এবং তরুণ বয়স পরিব্রজনের মধ্য দিয়ে কাটে। অভিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে যথা মাণিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ফেণি, ঢাকা, কৃষ্ণনগর, চুঁচুড়া, কুড়িগ্রাম, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর তিনি চলে যান ঢাকা শহরে এবং চাকরিসূত্রে কিছুকালের মধ্যে ১৯৪৯ সালে যেতে হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে। ১৯৫১ সালে পাকিস্তান দূতাবাসের প্রেসএটাশির দায়িত্ব নিয়ে করাচি ছেড়ে পাড়ি দিতে হয় বিদেশে— ১৯৫১ সালের ৫ই মে তিনি নতুন দিল্লীর পাকিস্তান হাই কমিশনে যোগ দেন এবং দেড় বছরের মধ্যে তাঁকে যেতে হয় অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে। ১৯৫৪ তে আবার ফিরে আসেন ঢাকায়।

তারপর দীর্ঘ সময় তিনি কাটান ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম - জার্মানি এবং ফ্রান্সে। মৃত্যুর আগে ১৯৬৭ সালে আগষ্ট মাসে তিনি ইউনেস্কোর কর্মী হিসাবেও বিদেশের বাসিন্দা। মাঝে ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ দু'বার স্বদেশে আসতে পেরেছেন। ঊনপঞ্চাশ বছর আয়ুসীমায় প্রায় অর্ধেক সময় তিনি প্রবাসী, দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি এবং স্বজনদের উষ্ণতা থেকে বহু যোজন দূরে নিঃসঙ্গ হৃদয়ের বেদনা বহন করে, দিনের পর দিন একাকী অতিবাহিত করেন। তাঁর এই অনিবার্য প্রবাসী জীবন অনেক সময় তাঁর সমালোচকদের কাছে তীরের ফলা হয়ে উঠেছে। বাংলাভাষা চর্চার অধিকার এবং শক্তি নিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে তাঁরা কূটতর্ক তুলেছেন। তাঁদের রূঢ় মন্তব্যে বিদ্ধ হয়েছেন তিনি।

মধুসূদন দত্ত তাঁর তরুণ বয়স থেকে ইংরাজী ভাষার লেখক রূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে চেয়েছেন। সময় যদি বর্তমান কাল হতো, তাহলে হয়ত মাইকেল মধুসূদন তত্ত ইংরাজী ভাষায় প্রথম ভারতীয় সৃজনশীল স্রষ্টা রূপে সামাজিক প্রতিষ্ঠা খুঁজে নিতে পারতেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাভাষার প্রেক্ষিত ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপন এবং পণ্যমুখীনতা তখনো সমস্ত পৃথিবীতে শিল্প সংস্কৃতিতে গিলে ফেলতে পারেনি। ফলে লাভবান হয়েছে বঙ্গভাষা, মধুসূদনের ব্যর্থতার যন্ত্রণা বাংলা সাহিত্যে সোনার ফল ফলিয়েছে। অন্যদিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কিন্তু তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রারম্ভিক কাল থেকে আবহমান বাংলাভাষার লেখক হয়ে উঠতে চেয়েছেন। পারিবারিক আবহাওয়া কিংবা বিত্তগত কৌলিন্যে তিনি অনায়াসে মধুসূদনের মতো এক দূরাভিসারী আকাঙ্ক্ষায় আলোড়িত হতে পারতেন। পরবর্তী কালে আমরা তাঁর ইংরেজি ভাষাচর্চার একাধিক নিদর্শের উল্লেখ পেয়েছি। বিদেশে বিশেষত ইউরোপে জীবনযাপনের সুযোগ, ইংরাজি ভাষা এবং সাহিত্যে প্রগাঢ় বুৎপত্তি, উচ্চকোটির জীবনিকান্যস্ত - যাপন হওয়া সত্বেও মৃত্যুর প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সর্বতোভাবে হয়ে উঠতে

চেয়েছেন— একজন বাঙালি লেখক। যাঁর রক্তে মজ্জায় শিরায় তন্তুতে নিবিড় নিবিড়তর হয়ে আশ্লিষ্ট হয়ে আছে আবহমানকালের বঙ্গদেশ আর তার নির্জন গ্রামীণতার অবসিত, এক নির্জিত কৃষিনির্ভর অর্থনীতির জোয়ালবদ্ধ পশ্চাৎপদ জনসমাজের সংকট সমকালের ভয়াবহ আরতি সবকিছুকে তারা অতীতচারিতার প্রেক্ষিত দিয়ে বুঝে নিতে চায়। শিক্ষা এবং প্রগতি যাদের কাছে কোনো উচ্চাশার বাণী বহন করে নিয়ে আসে না, নীতিগত সংকটেও তারা যুক্ত হয় না, বরং নিজেদের নিঃশেষে সমর্পণ করে দিতে পারে এক অলীক - বিশ্বাসের ভর দেওয়া আনুগত্যের কাছে। প্রতিটি পরাজয় তাদের কাছে নিয়তির ভয়ঙ্কর নির্দেশের মতো— ফলে তাদের সমাজ ক্রমশ এক গতিহীন নিঃশ্চুপ জলাশয় হয়ে ওঠে।

কাজি আফসারউদ্দিন আহমদকে একটি চিঠিতে একদা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জানিয়েছিলেন— '...সাহিত্যিক হতে হবে বলে লেখা সে আমি ঘৃণা করি। প্রাণের উৎস থেকে না বেরুলে সে আবার লেখা। আপনা থেকে যা বেরুতে তা-ই খাঁটি।...I want to write মুসলমান সমাজ নিয়ে। —আমার সমগ্র মনের ইচ্ছে সেদিক পানে। এও একরকম Passion থেকে সৃষ্টি। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ হয়তো অজ্ঞ নই; কিন্তু অধঃপতনের এই যে একটা চূড়ান্ত অবস্থা, সেই অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত করতে চাই।

ব্যক্তিগত পত্রাংশের এই সুগভীর বিশ্বাস নেহাত কথার কথা ছিল না, সে প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কৃশতনু তিনটি উপন্যাস, গুটিকয় নাটক এবং অসামান্য ছোটগল্পগুলিতে। এক প্রান্তিক পশ্চাৎপদ, অধঃপতিত জনগোষ্ঠীর বেদনা এবং বাস্তবতাকে তিনি বহুদূরে, বিদীর্ণ প্রবাসে থেকেও ভুলতে পারেননি। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, 'মানুষের নিঃসঙ্গতাই আসল ও খাঁটি রূপ হয়তো।' ফলে ব্যক্তি মানুষের প্রাতিস্বিক চেতনালোকের অন্ধকার গূঢ়-জগত এবং বহির্বিশ্বের তীব্র দোলাচলজনিত সংঘাত এই দুটি প্রান্তবিন্দু তাঁর রচনাবলীকেসবসময় ধনুকের জ্যায়ের মতো টান টান স্পর্শ করে থাকে। স্রষ্টার ব্যক্তি অবস্থানকে তিনি সামাজিক অন্বয়ের সঙ্গে, শ্রেণির যূথবদ্ধতায় সমীপে মিলিয়ে দেখে নিতে চেয়েছেন। বাঙালি মুসলমান সমাজের বাস্তবতা এবং ধ্বংসমুখ পশ্চাৎগামীতা তাঁকে দীর্ণ, আলোড়িত করেছে গভীরভাবে। তিনি জানতেন, '...পশ্চিমজগৎ আজ এগিয়েছে ততখানি এগুতে আমাদের ঢের দেরি। ব্যক্তিগতভাবে আমি হয়তো ততখানি এগিয়ে যাবো বা ছাড়িয়ে যাবো, কিন্তু আমার লেখা পিছিয়ে রাখবে তাদের জন্য যারা পিছিয়ে আছে। তাতে আমার ক্ষোভ নেই।'

'চাঁদের অমাবস্যা' সেই পশ্চাৎপদ্ পরাজয়ের উপাখ্যান। যেখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়ে চায় গোষ্ঠির সর্বগ্রাসী অন্ধকার আবহে। প্রতিবাদ কোনো প্রতিরোধের জন্ম দিতে পারে না। যুক্তি, ভীতির কাছে মাথা নিচু করতে বাধ্য হয়। সমাজ, এক অবয়বহীন। যে সমাজের স্থবিরতা তথা গতিহীনতা এক ধরণের কৃত্রিম অহংকারের জন্ম দেয়, সমাজের শিরায় শিরায় গোপন মৌলবাদের বীজ বপন করে' কোনপ্রকার উচ্ছ্বাস' এবং 'ভাবালুতার' কাছে আত্মসমর্পণ না করে, ব্যক্তিজীবনে অনেক দূরে সরে থেকেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এই প্রাকৃত সমাজের বাস্তবতা থেকে নিজেকে ত্যক্ত করেননি। তাঁর লেখায় হৃদয়হীন সমাজের তিমিরাচ্ছন্ন গহ্বর আর সেই স্নায়ুবিবশকারী অন্ধকারে গুহায় লুপ্ত জনগোষ্ঠীর অসহায় আত্মসমর্পণ, তারও চেয়ে বড় হয়ে ওঠে ব্যক্তির মানবিক সংবিত্তির সহসা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আলোরেখা। যে আলো হয়তো বা জ্বলে উঠেই নিভে যায়, সমাজের দুরন্ত প্রতাপে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই আলোরেখাগুলি আবহমান মানব - ইতিহাসের উজ্জ্বল উদ্ধার— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সৃজন - পৃথিবী আমাদের কাছে সেই বার্তা বারেবারে পৌঁছে দিয়েছে।

।।দুই।।

হিস্পানী গদ্যকার এবং দার্শনিক মিগুয়েল দ্য উনামুনোর উল্লেখ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনায় বিভিন্ন সময় আমরা পাচ্ছি। উনামুনোর জীবনকাল ১৯৬৪ থেকে ১৯৩৬। দুটি শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় তিনি সমকালীন স্পেনকে, স্পেনের আত্মিক সংকটকে ব্যাখ্যা করেছিল। যে স্পেন দ্বিধাবিভক্ত— যার একদিকে প্রগতিতাড়িত ইউরোপ আর অন্যদিকে দ্বন্দ্বশীল অতীতচারিত পিছুটান। উনবিংশ এবং বিংশ—এই দুটি শতাব্দীর সন্ধিকালে বঙ্গদেশের অবসিত ছন্নআশা মুসলমান সমাজের এক আশ্চর্য মিল আমরা দেখতে পাই।

আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে, প্যারি-সন্ধির ফলে কিউবা, পুয়ের্তোরিকো, ফিলিপিন, গুয়ান মারিয়ানাসের শাসনকর্তৃত্বচ্যুত হয়ে একটি বিশেষ স্তর ইউরোপীয় বিপ্লবের অভিঘাত উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কবি আন্দোনিয়ো মচাদো লিখছেন সেই রূঢ় বাস্তবতার প্রকৃত সংলাপ — 'এক স্পেন একদিকে মৃতপ্রায় / আর আরেক স্পেন প্রসারিত করে আছে দুই করতল/ অন্যদিকে।' দ্বন্দ্বজারিত এই কঠিন দুঃসময়ে একদিকে যখন সমগ্র জনগোষ্ঠী অতীতচারিতায় বিলীন হতে থাকে, তখন সমাজের গুটিকতক মানুষের অগ্রগমন কোন উন্নয়নকে চিহ্নিত করে না। ক্যাথলিক ধর্মাশ্রীয় আসল প্রাণ মন্তর কৃষকদের স্পেন যখন একদিকে সামন্ততন্ত্রের রক্ষণশীল শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তখন অন্যদিকে আপন শ্রেণিস্বার্থে অতন্দ্র, নিবিষ্ট মধ্যবিত্ত স্পেনীয়রা ইউরোপীয় ভাবাদর্শে তীব্রটানে ভেসে যেতে উৎসুক। মুর আর রোমান দুই অতীত সংস্কৃতির প্রলেপ যখন নতুন কোনো চেতনার জন্ম দিতে অপারগ, তখন প্রগতির খোঁজে কেউ কেউ শিকড়-সন্ধানের পরিবর্তে শিকড়ের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে প্রবল উৎসুক। এমন অবস্থায় এক দীর্ঘস্থায়ী বিষাদ জাতির আকাশে স্থায়ী আশংকার রূপ নিয়ে হৃদয়ের ক্ষতগুলির অনিবারণীয় করে তোলে।

মিলিয়ে দেখলে ইংরাজ শাসকদের করতলগত বঙ্গদেশে মুসলমান জনগোষ্ঠীও এই একই ধরণের ছিন্নতার শিকার। সামন্ত্রতান্ত্রিক শাসনের ভিতর দিয়ে তারা ফিরে পেতে চায় অতীতের স্বর্ণযুগ, আসলে যে অতীত - ঐতিহ্যের সঙ্গে দেশ আর মাটির সংযোগ অগভীর। যে অতীত - ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঙালি - মুসলমান সমাজের যোগসূত্র নেই বললেই চলে। ভারতবর্ষে প্রাক - ইংরাজ যুগে যে বাদশাহী শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে ছিলো সেই ক্ষমতা তথা শক্তি গরিমার অংশভাগ মাত্র বাঙালি মুসলমান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির কৃষিজাতকদের করায়ত্ত ছিলো না। চিরকাল তারা ছিলো ব্রাত্য প্রাকৃত এবং সর্বাংশে গ্রামীণ।

স্পেনীয় ক্যাথলিক মানসিকতার যে তীব্র ধর্মবোধ তৎকালীন স্পেনে ব্যাপ্ত ছিল, বাংলার মুসলমান সমাজে তার প্রতিস্ব হয়ে উঠলো ইসলামী আধ্যাত্মিকতা। কালে - কালোত্তরে বঙ্গদেশের জলমাটির গুণে সেই ধর্মীয় চেতনারও নানা লোকায়তিক রূপ দেখা দিয়েছিল। ইসলামের কট্টরপন্থীরা চিরকাল এই লোকভাবনাকে অনৈতিক আখ্যা দিয়ে এসেছে। ফলে বাঙালি মুসলমানদের একটি বৃহৎঅংশে ধর্মচেতনার জগতেও এক তীব্র দোলাচলের মধ্যে পড়তে বাধ্য হয়। যে মুসলমান কৃষক পীরের দরগায় মানত করে, শিরনি চড়ায়, মহরমের উৎসবে জারি গান গায়, সারিগানের সুরে সুরে দু'কুলপ্লাবী পদ্মা - মেঘনার দুরন্ত ঢেউয়ে ঢেউয়ে বৈঠার ঘা মারে, সেই আবার অর্ধশিক্ষিত ধর্মগুরুর দায়হীন প্ররোচনায় কখন যে মৌলবিবাদের অন্ধশরিক হয়ে ওঠে। তখন তার চোখের প্রগতির বার্তা ধর্মহীনের কু-ডাকের মতো, কুসংস্কার এবং প্রথানুগত্য, অন্ধঅনুগত্য ধর্মরক্ষার একমাত্র নিশান হয়ে ওঠে।

শৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সর্বতোভাবে এই বিভ্রমজারিত, পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কথাকার হয়ে উঠতে চেয়েছেন। ইতিহাসের

নির্মম আঁচড়ে যে জাতি ভ্রষ্ট, নষ্ট—কিন্তু কোথায় যেন আত্মার গহনে তারা গোপনে লালন করে রাখে জীবনযাপনের অম্লান শুভবোধ। সম্প্রদায় এবং সাম্প্রদায়িকতার ক্লিন্ন খাঁচার থেকে যেখানে আরও বড় হয়ে ওঠে মানবিকতার আদিগন্ত প্রসারিত নীল আকাশ। ওয়ালীউল্লাহ্ লক্ষ্য করেছিলেন, বাঙালি মুসলমান সমাজের দিকভ্রষ্ট দুটি প্রান্তবিন্দুকে। যে প্রান্তবিন্দুর এক প্রান্তে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র অংশ, যারা ইউরোপীয় আলোকধারায় নিজেদের স্নাত করে, জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গড়ে তোলার প্ররোচনায় লিপ্ত। যাদের জীবনযাপনের একমাত্র অবলম্বন পরানুকরণ এবং ঐতিহ্যের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপন। আর এর বিপরীতে রয়েছে এক সুবিশাল প্রান্তবাসী জনগোষ্ঠী — যারা অতীতচারিতার ক্ষয়কে নিয়মিত ভেবে নিয়েছে মৃত্যু এবং ধ্বংসের বিনিময়ে। অতীত তাদের কাছে আশ্রয়, কিন্তু তারা ইতিহাসের বিনির্মাণ বুঝতে চায় না। ফলে তাদের জীবনবোধ আটকে থাকা এক সংকীর্ণ রীতিবাদের আশ্রয়ে, যখন তারা জীবনের সমস্ত অর্থ খুঁজে নিতে চায় ধর্মগ্রন্থ কিংবা ধর্মায়তনের একমাত্রিক পরিধির আয়তনে। জীবনযাপনের যে আবহমান লোকায়তিক প্রবাহ এর কোনো মূল্য তারা স্বীকার করে না। যে বোধ অর্জনের জন্য প্রয়োজন অন্তর্মানুষের ভেতর - ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো তাকে বুঝে নেওয়া। উনামুনো আত্মবিনাশকারী ‘পরানুকরণের’ বিরুদ্ধে লিখেছেন প্রমাণিত ইতিহাস চেতনার আশ্রয়ে। যে ইতিহাস চেতনা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ব্যক্তিমানুষের আত্মগত প্রতিস্ব - ভাবনার আয়তনে। ইতিহাসের ভেতরে যে প্রচ্ছন্ন ইতিহাস তার নিবিষ্ট সন্ধান এবং ব্যক্তিমানুষের অন্তর্ভেদী অস্তিত্বের সংকট— এই দুটি স্তরকে ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর রচনার অন্তর্বয়নে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। আধুনিক জীবনের ধূসর প্রচ্ছায়ায় মানব জীবনের শিকড়ছেঁড়া যাপনের বিয়োগান্ত ছবি যেমন তিনি চিত্রিত করতে চেয়েছেন নিরাবেগস্রষ্টার বলিষ্ঠ প্রাচুর্যময় উদ্যাম নিয়ে, ঠিক সেভাবে জাতিসত্তার গভীরে একটি সম্প্রদায়ের ‘একা’ হয়ে যাওয়ার, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার বাস্তবতার নির্মাণও করেছেন তাঁর কৃশতনু আখ্যানত্রয়ীতে। তাঁর বর্ণিত বিষয়গুলি সম্প্রদায় বিশেষের ক্ষয় ও অনিবারণীয় তলিয়ে যাওয়ার মর্মন্তুদ উপাখ্যান, যেখানে কাহিনীর প্রতিটি পরতে রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে থাকে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের প্রবল সংকট। ঘটনার আবর্তে জড়িয়ে যাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি— আরেফ আলি, চাঁদের অমাবস্যা’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, বিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির এক বিচ্ছিন্ন ভীরু প্রতিস্বর, —যে আত্মত্রাণকল্পে ধর্মীয় চেতনার চোরাবালিতে আশ্রয় খুঁজে নিতে চায়, কিন্তু শেষ অবধি তাকে অনিবার্য পৌছে যেতে হয় বাস্তবের কঠিন তীক্ষ্নমুখ বর্ষা ফলকের ফলার শিখরে। বাঙালি মুসলমান সমাজের পরিত্রাণহীন দুঃস্বপ্নের আখ্যান শিল্প ‘চাঁদের অমাবস্যা’— যার পটভূমির প্রেক্ষিতে থেকে যায় এর ভবিষ্যৎহারা, বিষাদ এবং অবসাদে জর্জর, নিয়তিতাড়িত দুঃস্থ সম্প্রদায়ের ক্রমশ অস্তিত্বহীন, শিকড়চ্যুত হয়ে যাওয়ার মর্মস্পর্শী ইতিবৃত্ত।

।। তিন ।।

বাঙালি মুসলমান - সমাজ চিরকাল কেমন যেন ‘ডায়াস্পোরিক’। তারা হিন্দু - সমাজের কেউ নয়, জাতির প্রশ্নে তারা নিজেদের চিহ্নিত করে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বৃত্তরেখার আড়ালে। তাদের অর্জনে কোনও উত্তরাধিকার নেই, একথা যেন তারা নিজেরা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছে। এইরকম ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে বাঙালি মুসলমান সমাজের শ্রেণিগত অবস্থান।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অনেকের পূর্বপুরুষ বহিরাগত, একথা খানিকটা সত্য হলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানেরা মূলত ঃ এদেশের অমুসলমানদের উত্তরপুরুষ। বাংলার মুসলমান সমাজের ভিতর যে সামাজিক বর্ণবিন্যাস আমরা লক্ষ্য করি, তার একেবারে উপরের স্তর রয়েছে বিদেশাগত মুসলমানদের একটি অংশ। এদের মধ্যেও আশরাফ - আতরাফ, শরীফজাদ - আজলাফজাদ হিসেবে কূট-বৈষম্য ছিল। আবার হিন্দু সমাজ থেকে আসা ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা মূলতঃ গ্রামীণ কৃষিজীবী, ফলে তারা পূর্ব পুরুষাগত বর্ণ এবং বৃত্তি অনুযায়ী নানাস্তরে বিভাজিত ছিল। সম্পদ এবং ভাষার প্রশ্নেও মুসলমান সমাজের সংকট সমাজের বিভিন্নস্তরে নানাভাবে লক্ষ্য করা যেতো।

ইংরেজ - শাসনাধীনকালে ভারতীয় সমাজকাঠামোয় বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। গ্রামভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভাঙন আসে, গ্রামীণ মানুষের স্বচ্ছল অংশটি শহরমুখী হতে থাকে। সমাজে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ মাত্রা নেয় ‘মুদ্রা’— যেখানে এতকাল ‘জমি’র নিরঙ্কুশ আধিপত্য সমাজে স্বীকৃত ছিল। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ভিতর নতুন ধরণের শ্রেণিবিন্যাস দেখা দেয়।

যে-বিন্যাস এবং ভাঙন হিন্দু এবং মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিলেও, পুণর্গঠনের ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়তে থাকে। এর প্রধান কারণ, নতুন অর্থনৈতিক বিন্যাসে ‘নগদ টাকার’ যে গুরুত্ব স্পষ্ট হতে থাকে, মুললান সমাজের সংখ্যাগুরু অংশের দখলে সেই অলৌকিক ‘মুদ্রা - সম্প্রদের ’ অবিসংবাদী অধিকার ছিল না। ইংরেজ - শাসনে হিন্দু এবং মুললমান উভয় সম্প্রদায় - ভুক্ত অভিজাতের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, কিন্তু নতুন যে - আর্থিক -শক্তি সম্পন্ন শ্রেণি ভারতবর্ষে বিশেষত বঙ্গদেশে মাথা তুলতে থাকে, তাদের বেশির ভাগ অংশটি হিন্দু - সমাজ থেকে আগত। এই নতুন ‘হেজেমনি’ -সমাজ গ্রাম ত্যাগ করে, তারা শহরকে নিজেদের বাসভূমিতে পরিণত করে।

ফলে গ্রামীণ কৃষিজাতকেরা, যেখানে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছিলেন, তাদের মধ্যে শোচনীয় দুর্দশা স্থায়ী - সংকট হয়ে উঠে। কিন্তু নতুন অর্থনৈতিক বিন্যাসে বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যার সংখ্যাগুরু অংশ হিন্দু— তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন ঘটে যায়। সরকারী চাকরির ছাড়াও ব্যবসা - বাণিজ্যের মাধ্যমে এরা সমাজের সামনের সারিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করে তোলেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এরাই নতুন সমাজ এবং সংস্কৃতি - আন্দোলনের পুরোধা হয়ে ওঠেন। ফলে বাংলার নবজাগরণের যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার একচেটিয়া ফলভোগ করে হিন্দু সমাজ— দেশের সর্বত্র হিন্দু প্রাধান্য স্বীকৃত ওঠে।

অথচ মুসলমান সমাজ ঐতিহাসিক ক্ষমতা এবং ঘটনার পারম্পর্যে ক্রমশঃ পশ্চাৎমুখি হয়ে পড়ে। কিন্তু সমকালীন ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যে তারা বারবার জাতি - স্বীকৃতির খোঁজ করে চলে। নতুন সামাজিক বহুস্তরীয় বিন্যাস, মানবিক সম্পর্কের পুনর্বিচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকল্পে বাঙালি - মুসলমান গন্তব্য খুঁজে নেয় ধর্মচেতনার নিবিড় আশ্রয়ে। তরীকা-ই -মুহম্মদীয়া, ফারায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের প্রতিরোধ যুদ্ধ— সমস্ত কিছু ছিল এই ধর্মচেতনার অংশত বহিপ্রকাশ। যদিও এইসব আন্দোলনের সঙ্গে জমির কর্তৃত্ব এবং উৎপাদন সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল, কিন্তু তবুও এইসব আন্দোলনের অভিঘাতে মুসলমানদের একটি বিশেষ অংশের মনে ‘প্যান - ইসলামের’ বীজ রোপিত হয়ে যায়। ধর্ম আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলামে ফিরে যাওয়া— সুতরাং এইসব আন্দোলন যতটা না অগ্রগমনের তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে ওঠে প্রাচীনতর এক অনাস্বাদিত জীবনযাত্রার দিকে সমগ্র সমাজের পিছুটান। যা মুসলমান সমাজকে আধুনিক জীবনযাপন ভাবনার সঙ্গে যুক্ত না করে, সমকালীনতার সঙ্গে স্থায়ী বিচ্ছেদ সম্ভব করে তোলে। ফলে মুসলমান সমাজে যেমন একদিকে ব্যক্তি - স্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষ ঘটায়, অন্যদিকে অমুসলিম সমাজ এবং সংস্কার সম্পর্কে একটি চরম অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক

মনোভাবের সূচনা করে। মূলতঃ অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে যেমন শিক্ষাত্রেত্রে বাঙালি মুসলমান পিছিয়ে পড়ে, অন্যদিকে সমাজের একটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংস্কৃতির পিছুটানে ক্রমশ মৌলবাদের ক্ষতগুলিকে পুষ্ট করে তোলে। ধর্ম-আন্দোলনের সুকৃতিগুলি যত না মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর মানবিক সংবিত্তির উন্মোচন ঘটায়, তার চেয়ে বেশি তারা জনিয়ে যায় এক পশচাৎগামী ক্ষয়শীল পতনউন্মুখ মানসিকতার শৃঙ্খলে।

চাঁদের অমাবস্যা' প্রেক্ষিতকে বিশ্লেষণ করতে হলে এই সামাজিক অর্থনীতির দোলাচল আলোড়িত ঐতিহাসিকতাকে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। ওয়ালীউল্লাহ্ গভীরভাবে জানতেন এই মহাবিশ্বের প্রতিটি মানুষ 'একা' —আরেফ আলী সেই অবরোহী - নিঃসঙ্গতার একটি ছিন্ন - প্রতিভাস মাত্র— আর ওয়ালীউল্লাহ্ চেয়েছেন আরেফআলীর ব্যক্তি - সংকটের আবর্তে শরীরীভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠুক বঙ্গদেশের 'একা' হয় থাকা মুসলমান সম্প্রদায়ের নৈরাজ্যতাড়িত পতনশীল বাস্তবতা।

।।চার।।

১৮৭০ সালের আগে মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ প্রায় ছিল না বলা যায়। এর প্রধান কারণ অর্থনৈতিক; চরম দারিদ্রের কারণে তাদের সামনে আধুনিক শিক্ষার দরজা বন্ধ ছিল। ১৮৭০ সালের পর শিক্ষা সংক্রান্তনীতিতে কিছু পরিবর্তন আসে, ফলে আধুনিক শিক্ষার রুদ্ধদ্বার মুসলমানদের সামনে খানিকটা উন্মোচিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা এই উন্মোচনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বাংলার বর্ণহিন্দু সমাজের সামনে এই শিক্ষার সুযোগ যতটা ফসল তুলে দিতে পেরেছিল, মুসলমান সম্প্রদায় সুযোগ পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। এর নেপথ্যে ছিল সামাজিক স্থিতাবস্থা এবং ধর্মীয় বাতাবরণ— এই দুটি প্রান্তবিন্দু। স্থিতাবস্থার কারণে মুসলমান সমাজে ধর্মীয় কর্তৃত্ব সর্বগ্রাসী এবং নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে। আবার এই ধর্মবোধই সামাজিক অচলায়তনের স্থিতাবস্থাকে বছরের পর বছর একইভাবে রেখে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত 'পল্লীশিক্ষক' পত্রিকায় মোহম্মদ তামসিরউদ্দিনের 'উচ্চশিক্ষা ও বঙ্গীয় মোসলমান' শীর্ষকে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আধুনিক শিক্ষাজগতে মুসলমান সমাজের অনুপস্থিতির সামাজিক প্রেক্ষিতটিকে তামসিরউদ্দিন যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করেছেন। যে কারণগুলি তিনি তুলে ধরেছেন তা হল—সর্বগ্রাসী অসহ - দারিদ্র, বাংলাভাষা এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বীতরাগ এবং বৈরীভাবপোষণ, গ্রাম থেকে বহুদূরে স্থাপিত শিক্ষায়তনগুলির ক্ষেত্রে উদাসীনতা, উৎপাদন ক্ষেত্রে কৃষি - অভিমুখিনতা, পশ্চাৎপদ্ উৎপাদন পদ্ধতি, আধুনিকতার প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমান, শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয়বাহুল্য এবং সর্বোপরি 'পুরোপুরি বাঙালি বনিবার অনিচ্ছা'। তামসিরউদ্দিনের রচনার কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি।

> ১। সমাজের চালকগণের একদেশ-দর্শিতা ও স্বার্থসিদ্ধির বাগুরা বিস্তার। স্বার্থপর নেতৃগণ (স্বয়ং প্রভু বা আপনি মোড়ল এক শ্রেণীর অপরিণামদর্শী চালক) কর্ত্তৃক ভ্রান্তভাবে চালিত হইয়া বঙ্গীয় মোসলমান সমাজ ঘোর প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। কর্ণধার বিহীন মোসলেম সমাজ - তরণী ইঁহাদের দ্বারা সুপথে চালিত হয় নাই কেবল বিপদ হইতে বিপজ্জনক অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। অপরিণামদর্শী চালক তাহার এই দুরবস্থার কারণ। কেবল ধর্ম - বিদ্যা, আরবী, পার্শী ও উর্দ্দু শিক্ষাকেই মহাপুণ্যজনক, শ্রেষ্ঠ ও সারশিক্ষা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। সাংসারিক শিক্ষা দীক্ষার কথা প্রায়ই আলোচনা করা হয় না। বাঙ্গালা ইংরেজী শিক্ষা ও গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চ বিদ্যাচর্চাকে পুণ্যজনক ও অপরিহার্য্য বলিয়া ব্যাখা করা ত দূরের কথা বরং এইগুলি অনর্থের মূল ও কুফরী বা নাস্তিক বিদ্যা বলিয়া এক শ্রেণীর তথাকথিত স্বার্থপর আলেম - নাম - ধারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়া থাকে। সাধারণ মোসলেম সমাজে এই শ্রেণীর আলেম নেতাগণের মত উপেক্ষার জিনিস নহে। ধর্ম বক্তৃতার সহিত জড়িত হইয়া এই প্রকার অভিমতগুলি সাধারণ জনসমাজে অত্যন্ত কার্যকরী হয়।
>
> ২। সঙ্গতিপন্ন বঙ্গীয় মোসলমান ধনী জমিদার, তালুকদার, মহাজন, গৃহস্থ প্রভৃতির শিক্ষার উদ্দেশ্যে আশানুরূপ অর্থদানের অভাব।/ ধর্ম্মবিদ্যার জন্য দান করিলে মহাপূণ্য হয় এই বাক্যের সঙ্গে 'মাতৃভাষা রাজভাষা উচ্চ গণিত বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার জন্য অর্থদানেও মহাপূণ্যের অধিকারী হইবে* এরূপ কথা প্রায়ই সাধারণ সমাজ শুনিতে ও বুঝিতে পায় না। মাদ্রাসার তালেবুল এলেমের কেতাবাদির জন্য অর্থদান করিতে সাধারণ সমাজ যত আগ্রহান্বিত স্কুল কলেজের ছাত্রের বই পুস্তক ক্রয়ের জন্য অর্থদান করিতে তত আগ্রহান্বিত দৃষ্টি হয় না।
>
> ৩। মোসলমানেরা স্বভাবতঃ স্বাধীনতা প্রিয়। চাকরী দাসত্ব বা অন্যের অধীনতা স্বীকারে সহজে ইহারা রাজী নহেন। এই সদ্গুণের সহিত মূর্খতা ও দরিদ্রতা মিলিত হইয়া তাহাদিগকে জোতদার হইতে ক্রমে কৃষক, বর্গাদার চাষা, কৃষাণ চাকর, মুটে মজুর, কোচম্যান, গাড়োয়ান, কুলি, কসাই, পাইক - পিয়াদা, বাবুর্চ্চি প্রভৃতি হীন হইতে হীনতর অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে এই সকল ব্যবসায়ের কতক পরিমাণে স্বাধীনতা বর্ত্তমান। বিদ্যাচর্চাবিমুখ অপরিণামদর্শী বঙ্গীয় কৃষিজীবী মোসলমান স্বাধীন ব্যবসায়ের নামে কুলি মজুর বনিবে কিন্তু উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া রাজ চাকুরী গ্রহণে রাজী হইবে না। 'চাক্‌রে হব' 'পরের গোলামী করব' 'ঘর ছেড়ে বিদেশে যাব' এ সব হবে না। এই মারাত্মক অপরিণামদর্শিতা, ও স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রভুত্বব্যঞ্জক ভাব মোসলমানদিগের নিকট আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চার কদর কমাইয়া দিয়াছিল। মোসলমানের অর্থনীতির দিক অন্ধকার। সমাজ চালকগণ এই ভ্রান্তি সংশোধন না করিয়া বরং ঐ মতেই সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন ও উক্ত ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন।
>
> ৪। পুরোপুরি বাঙালী বনিবার অনিচ্ছাও এতদ্দেশীয় মোসলমানের অধঃপতনের আর একটী কারণ। 'আমরা পশ্চিম হইতে আগত, সেই বাদশাহের জাতি আমরা কম কিসে? আমাদের ভাষা আরবী, পার্শী, উর্দ্দু, আমরা বাঙ্গালী নহি।' এইভাব ইঁহাদের মধ্যে বিরাজিত ছিল এখনও কাহার কাহার মধ্যে এ ভাব বিরাজমান রহিয়াছে।

এইরকম একটি ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের, কালের অভিঘাত দিক্‌ভ্রান্ত সমাজের ভেতরের মানুষ হয়ে উঠতে চেয়েছেন ওয়ালীউল্লাহ্। শুধুমাত্র সমাজের আয়তনে নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, ভাষার ক্ষেত্রে অগ্রগমণের ক্ষেত্রে— যে সম্প্রদায় বেপথু লক্ষ্যহীন। যাদের অবস্থান সমস্ত দেশের নিরিখে এক আলোকিত পটভূমিতে অন্ধকার অশরীরী প্রচ্ছায়ার অন্তরালে কোনমতে টিকে থাকা। অস্তিত্বের নিয়ত সংগ্রামে যারা দীর্ণ, অথচ অনস্তিত্বের খাঁচা ভেঙে যাদের কোনো উদ্ধার বাসনা নেই। আলো এবং অন্ধকার এই দুটি প্রেক্ষিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাঙালী মুসলমানের আত্মিক সংকটকে একটি দ্বন্দ্বতাড়িত প্রেক্ষণের গভীরে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন। 'লালসালু' উপন্যাসের 'মজিদ', 'চাঁদের অমাবস্যা'-র আরেফ আলী এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' আখ্যানের মুহাম্মদ মুস্তাফার যে সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় অবস্থিতি তাকে বিশ্লেষণী বিবেচনায় নিয়ে এসে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একটি নির্দিষ্ট কালের পরিসীমায় ন্যস্ত সমাজের অনবতুল বিষাদ এবং আত্মানুসন্ধানকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত আখ্যানসমূহ বহুমাত্রিক এবং একাধিক স্তরে বিন্যস্ত। একটি আত্মপ্রবঞ্চক, মুখোশ -

আঁটা, ধূর্ত সমাজের ভেতরে বসবাসকারী ব্যক্তিমানুষের আত্মানুসন্ধান আর নিয়তি - তাড়িত অনিবার্য বিষাদ, ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রধান অন্বিষ্ট। বেদনার সন্তান হয়ে তিনি সমকালকে, স্বসমাজকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। 'চাঁদের অমাবস্যা' সেই নিবিষ্ট শিল্পসৃষ্টির এক মহত্তম ও সুউচ্চ স্মারক।

।। পাঁচ ।।

'চাঁদের আমাবস্যা' উপন্যাসে কোনো মহিলা - চরিত্র নেই। একজন মহিলার উল্লেখ আছে, কিন্তু তার কোনো নাম নেই— সামাজিক পরিচয়ে সে একজন গ্রাম্য-দরিদ্র নৌকাচালকের স্বৈরিণী বধূ। উপন্যাসের শুরুতে তাকে আমরা 'মৃত' আবিষ্কার করি। তাকে হত্যা করা হয়েছে, হত্যা করেছে একজন গ্রামীণ ভূস্বামী শ্রেণির মানুষ কাদের মিঞা। যে চরিত্রটির সঙ্গে নিহত নারীটির একটি গোপন অবৈধ যৌন সম্পর্ক ছিল। মৃতদেহটি আবিষ্কার করে গ্রাম্য - দরিদ্র পরাশ্রয়ী 'যুবক শিক্ষক' আরেফ আলী। উপন্যাসের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে তাঁর নাম নেই— বরং সেখানে তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে ব্যাক্তিগত পেশার উল্লেখ করে।

'যুবক শিক্ষক' আরেফ আলী সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির প্রতিনিধি। জীবিকার ক্ষেত্রে যে শিক্ষাব্রতী হলেও, আমাদের বুঝে নিতে কষ্ট হয় না, যে সে আসলে আবহমানের কৃষিজাতকদের উত্তরসূরী। আরেফ আলীর ব্যক্তি এবং সামাজিক পরিচয় আমরা যেভাবে পাচ্ছি—

> ১। আরেফ আলীর বয়স বাইস-তেইশ। কিন্তু তার শীর্ণ মুখে, অনুজ্জ্বল চোয়ালে বয়োতীতভাব : যৌবনভার সে যেন বেশিদিন সহ্য করতে পারেনি। সে-মুখে হয়তো যৌবনকন্টক জন্মেছিলো, কখনো যৌবনসুলভ পুষ্পোদগম হয় নাই। কয়েক বছর আগে মাদ্রাসা - হাসিদের প্রভাবে দাড়ি রেখেছিলো, আজ সে- দাড়ি নাই। কিন্তু এখনো মনে হয় থুতুনির নিচে কেমন উলঙ্গতার ভাব । খাড়া নাক চিকন, কপাল ঈষৎ সমুন্নত, চোখে একটু কাঠিন্যভাব। তবে রসশূন্য স্বাস্থ্যের জন্যেই তার চোখ কঠিন মনে হয়। লক্ষ্য করে দেখলে সে -চোখের সরলতা, সময়ে - সময়ে অসহায়তাও নজরে পড়ে। কখনো - কখনো তার মধ্যে উদ্ধতভাব ও দম্ভ দেখা যায়, কিন্তু সেটা শিক্ষকতা করে বলে চড়ানো ব্যাপার। তবু একটু অহঙ্কার নাই যে তা নয়। দম্ভ - ঔদ্ধত্য না হোক, শিক্ষক হলে অহঙ্কার না হয়ে পারে না। তবে সেটা কৃত্রিম নয় বলে সযত্নে ঢেকে রাখে, শুধু ক্বচিৎ-কখনোই তার আভাস পাওয়া যায়।
>
> ২। দরিদ্র যুবক শিক্ষক, কোপন নদীর ধারে ক্ষুদ্র চাঁদপারা গ্রামে তার জন্ম। কষ্টে - সৃষ্টে নিকটে জেলা - শহরে গিয়ে আই.এ.পাশ করেছে, সুপরিচিত নদী-খাল-বিল -ডোবা-মাঠ-ঘাট সুদূরপ্রসারী ধান - ফসলের ক্ষেতের বাইরে কখনো যায় নাই। সমতল বাংলাদেশের অধিবাসী, পর্বতমালা কখনো দেখে নাই। বই-পুস্তকে, সাময়িক পত্রিকা সংবাদপত্রে কোন কোন পর্বতের ছবি দেখেছে, কিন্তু অনেক পর্বতের শুধু নামই শুনেছে। এণ্ডিজ, উরাল, ককেসিযান আলতাই পর্বতমালা। কত নাম। সব স্বপ্নের মত শোনায়।

এমন একজন— সমাজের প্রান্তিক মানুষ যে বাস্তব - জীবনে শুধুমাত্র হতবল নয়, দারিদ্রের কারণে পরাশ্রয়ীও। মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে আরেফ আলীকে আমাদের চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

> 'দু' বছর আগে আরেফ আলী শিক্ষক হয়ে এ-গ্রামে আসে। থাকার আশ্রয় পায় বড় বাড়িতে। খাওয়া - দাওয়াও সেখানেই হয়। তার বদলে বড়বাড়ির ছেলেদের দুই - বেলা ঘরে পড়ায়। তার বিশ্বাস এই যে যত নেয় তত সে দেয় না, কিন্তু সেটা দয়াশীল দাদাসাহেবেরই ব্যবস্থা। দাদাসাহেবের প্রতি তাই তার ভক্তি শ্রদ্ধার অন্ত নাই।
>
> দক্ষিণে তিন মাইল দূরে তার নিজের গ্রাম। দরিদ্র সংসার, হাতের তালুর মত একটুকরো জমিতে জীবনধারণ চলে না। টেনে - হিঁচড়ে আই.এ.পাশ করে সে দেশে ফিরে আসে। পড়তে পারলে আরো পাস করতো, কিন্তু কলেজের ফি,বইখাতা কেনার পয়সা আর যোগাড় হয় না। তাছাড়া, জেলাশহরে ঘুপ্‌সি—আস্তানায় থাকলেও খরচ হয়। একরত্তি শাক-সব্জির জমিটাও বিক্রি করে উচ্চশিক্ষার পশ্চাতে ছোটার অর্থ হয় না।
>
> বর্তমান চাকুরিতে আরেফ আলীর অসন্তোষের কারণ নাই। বরঞ্চ তার বিশ্বাস, ভাগ্য দয়াবান না হলে এমন চাকুরি সহজে মিলত না।'
>
> বাস্তবের নিদারুণ কষাঘাতে - তাড়িত অথচ স্বপ্নপ্রবণ আরেফ আলীর আশ্রয়দাতার সামাজিক স্থানাংক এবার বিবেচনায় আনা যাক—
>
> 'দাদা সাহেব বড়বাড়ির প্রধান মুরুব্বি। দীর্ঘ প্রশস্ত মানুষ, পৌঢ়-বয়সেও মুখভরা একরাশ কালো দাড়ি। তবে চুল - গোঁফ সুন্নত অনুযায়ী ছোট করে ছাঁটা।
>
> বছর পাঁচেক হলো দেশের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তার পূর্বে তিনি সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন বলে কেবল ছুটি - ছাটাতেই দেশে আসতেন। সারা জীবন চাকুরি করেছেন বটে কিন্তু চাকুরিতে কখনো মন ছিলো না। মাজ্‌হাব-শরিয়ত ব্যাপারে সর্বদা মশগুল থাকতেন বলে কর্মজীবনেও বিশেষ কৃতকার্য হয় নাই। উপাধি - ইনাম তো দূরের কথা, পদোন্নতিও বিশেষ হয় নাই। অবশ্য সে-জন্য সেদিনও তাঁর কোন আফসোস ছিল না, আজও নাই। বরঞ্চ চাকুরিজীবন শেষ হলে তাঁর মনে হয়েছিলো, তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন : অবশেষে তিনি নিজের সময়ের ষোল আনা মালিক হলেন, তাতে কারো হিস্যা - দাবি থাকলো না। তাছাড়া, এবাদতে এবং মাজ্‌হাবী কাজ সম্পূর্ণভাবে মনঃপ্রাণ দেবার পথে আর কোন বাধা থাকলো না।
>
> অন্য একটি কারণেও চাকুরিজীবনে তিনি সুখী ছিলেন না। সে-জীবন পরাধীন যুগে কেটেছে। পরাধীনতার অবমাননা যতটা তাঁকে কষ্ট দেয় নাই ততটা দিয়েছে মনিবের বিধর্মীয়তা। বিধর্মীয় মনিব তাঁর প্রিয় ধর্মের প্রতি প্রকাশ্যে কোন বিরোধিতা বা অবজ্ঞা প্রকাশ না করলেও তার সে - বিরোধীতা - অবজ্ঞা অহরহ অনুভব করেছেন। এমন মনিবের অধীনে গোলামি করা নিতান্তই পীড়াদায়ক। অবসরপ্রাপ্তিতে তাই তাঁর আনন্দের সীমা থাকে নাই।*

মুসলমান সমাজের ত্রিশ উচ্চকোটির বাসিন্দাদের একটি বিশেষ শ্রেণির প্রতিভূ 'দাদাসাহেব'। যাদের দাসত্বে তীব্র অনীহা, অথচ কালের নিয়মে সেই বিরোধীতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় তারা। 'ক্ষমতার' তত্ত্বে অসীম আস্থা থাকা সত্ত্বেও যারা অর্থনীতির চোরাটানে ক্ষমতার দাস' হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। ফলতঃ অনিবার্য পরিণতি কখনো কখনো তাদের মনে হয় 'গোলামী মুক্তি'র অনাস্বাদিত আনন্দ। আর এই 'আনন্দের' পিছনে কাজ করে তাদের ধর্মীয় ইতিহাসবোধ—আদতে যে চেতনাও পরদেশি, এক অন্যভাষা-ঐতিহ্য

এবং পুরাণকথা থেকে উৎসারিত।

‘কিন্তু ইতিহাসের কথা দাদাসাহেব কখনো - কখনোই বলেন। ইতিহাস মানুষের সৃষ্টি। তাঁর মতে, মানুষের সৃষ্টির কথা তুললে ভালো - খারাপের কথা ওঠে। দয়াবান নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্র মহৎ খালিফা উমর বা রশীদ - মামুনের কথা তুললে ইয়াজিদ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ - মত্‌ুাওয়াক্কিলের নৃশংসতা, হীনতা, বিশ্বাঘাতকতার কথা ঢেকে রাখা যায় না। কখনো - কখনো দাদাসাহেব গভীর দুঃখের সঙ্গে ভাবেন, দ্বিতীয় দলই যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কী করে তাদের কথা ধামা - চাপা দিয়ে রাখা যায়? তাদের কথা ভাবলে কোন - কোন সময়ে তাঁর হৃদ্‌কম্পনের মত ভাব হয়। শুষ্ক হৃদয়ে ভাবেন, নির্দয় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নাকি নিজেই পনেরো হাজার মানুষের মস্তকচ্যুত করে। একটি - দুটি নয়, পনেরো হাজার মানুষ! ওবাইদুল্লাহ্‌ বিন জিযাদ কসাই নাম অর্জন করেছিলো তার নিষ্ঠুরতার হিংস্রতার জন্যে। ইতিহাসের কথা তুললে তাদের নাম কি এড়ানো যায়?

দাদাসাহেব এ-কথা বোঝেন যে পাপ -মন্দের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম চিরন্তন।

খোদা সত্যপথ দেখিয়েছেন মানুষকে, কিন্তু ক-জন মানুষ সে-পথে চলতে পারে? তবু একটা কথা থাকে। মানুষ কু’পথে কেন যায়।’

‘দুনিয়ায় কাদেরের যখন আবির্ভাব হয় তখন দাদাসাহেবের ওয়ালেদ বয়োবৃদ্ধ। তখন তাঁর চোখে ছানি পড়েছে, হয়তো চরিত্রে ভীমরতির আভাসও দেখা দিয়েছে। জন্মের প্রথম দিন থেকেই অপ্রত্যাশিত শিশুসন্তান তার বাপের চোখের মণি হলো। তাতে দোষ নাই। সবাই মেনে নিলো তাঁর শেষ - সন্তানের প্রতি অপরিমিত স্নেহ : বৃদ্ধবয়সে নোতুন প্রাণের সংস্পর্শে জীবনের প্রতি পুনরুদ্ভুত তীব্র অভীপ্সা কৌতুহলজনক হলেও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু চেতনাবোধের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের যে-চরিত্র প্রকাশ পেলো তাতে সবাই শীঘ্র সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো : তাদের আদর্শের সঙ্গে সে-চরিত্র যেন ঠিক খাপ খায় না। তার অদম্য খামখেয়ালী ভাব, উগ্র মেজাজ এবং সৃষ্টিছাড়া দুরন্তপনা তাদের কাছেই নেহাৎই বেখাপ্পা ঠেকে। কেবল বৃদ্ধ বাপ অবিচলিত থাকেন। তার বিসদৃশ চরিত্র হয়তো তাঁর নজরে পড়ে না। পড়লেও এবং সংগোপনে তার চারিত্রিক রুক্ষতা স্নেহের মলমে মোলায়েম করবার চেষ্টা করতে থাকলেও, সে-চেষ্টায় তিনি কৃতকার্য হন না।’

দাদসাহেবের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থানে কাদেরের ভূমিকা দায়হীন নিদ্রালস, উদাসীন। অথচ দাদাসাহেবের ভাবনা ছিল অন্যরকম— দাদাসাহেবের বাবা মা-দুজনেরই ততদিনে ইন্তেকাল হয়েছে। কাদেরের স্বভাব পরিবর্তনের পরে আশা হলো, সে-ই জমিজমা ঘর - সংসার দেখবে। ভরসা হলো, চারিত্রিক বিশৃঙ্খলা কেটেছে, এবার একটু কেমন বিহ্বলতা যে দেখা দিয়েছে তাও কাটবে এবং ঘর সংসারের জটিলতা বুঝতে তার দেরি হবে না। সে আশা পূর্ণ হয় নাই। ফলে কাদেরের সামাজিক নির্লিপ্ততার কারণে পরিবারের অর্থনৈতিক দায়— যা আসলে সংসারের বার তা বর্তায় দাদাসাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র হামিদের উপর। ‘সিধেসাধা গোবেচারা মানুষ, সদাসর্বদা আদেশাধীন, নম্র- বাধ্য। অশেষ শ্রমহহিষ্ণুতার সঙ্গে এবং বারম্বার চেষ্টার ফলে কলেজের শেষ পরীক্ষা কোন প্রকারে পাশ করলে সকলের আশা হয়, সে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করবে। যোগদান করেও ছিলো, কিন্তু ডাঙায় তোলা মাছের মত তার প্রাণ শীঘ্রই আইটাই করতে শুরু করে। চাকুরি অসহ্য হয়ে উঠলে তাতে ইস্তাফা দিয়ে দেশের বাড়িতে ফিরে আসে।’

অতএব ‘নামে শুধু কাদের সংসারের দায়িত্ব নিয়েছিলো। হামিদের প্রত্যাবর্তনের পর সে - দায়িত্বও থাকলো না।’ চাঁদের অমাবস্যা’ আখ্যানের সমাজ - বাস্তবতাকে বুঝতে পারলে সামাজিক - অর্থনীতির পটভূমিটিকে বোঝা প্রয়োজন। একটি বিশেষ সমাজের সম্পদ এবং দারিদ্র দুটি প্রান্ত একটি সম্পূর্ণ বৃত্তের দিকে ধাবমান। সম্পদ তৈরি করে নির্দায়, অলস অসচেতন, শিক্ষাহীন, অনৈতিহাসিক চেতনা স্রোত। যা সামাজিক প্রবাহকে দুষিত করে তোলে। অন্যদিকে দারিদ্র, ভীরুতার এবং মূঢ়তার জন্ম দেয়। ফলে ‘শিক্ষার আলো’ ও সেখানে কোনো সাহসী জ্যোতি প্রক্ষেপ করতে পারে না। ‘আলো’ তখন অমাবস্যার তিমিরে’ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। যুক্তিজাগর প্রখর চৈতন্য বোধও যে সর্বগ্রাসী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

‘নারীহত্যা’ বিষয়কে কেন্দ্র করে আরেফ আলীর সহকর্মীদের আলাপ এই যুক্তিহীন প্রবাহের আরেকটি অন্য দ্যোতক হয়ে ওঠে। যারা আলোচক, তারা শিক্ষক অর্থাৎ সমাজের সামনের সারির মানুষ। তাদের সেই প্রধানুগ সমাজ - চৈতন্যেও আরেফ আলীর সংযোগ নেই। ফলে সমাজের কোথাও সে নেই। অথচ সে সমাজের ভিতরে বসবাস করে। সামাজিক স্রোতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চায়। কিন্তু পারে না, আর এই ব্যক্তির অসহায় না - পারাটা ক্রমশঃ এক ভয়ংকর অস্তিত্বহীনতার দিকে চলে যায়। যখন সে প্রকৃতপক্ষে এক অতলান্ত খাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়াতে বাধ্য হয়। অন্ধকার আবহের কাছে আলো - চেতনার এই অনিবার্য আত্মসমর্পন এক ধরণের নির্বিবেক, হিমশীতল স্থবির সমাজ - পরিকাঠামোর পতনকে স্পষ্ট করে দেয়। ফলে আরেফ আলির প্রতিবাদহীন আত্মসমর্পন একটি বিশেষ সমাজের নৈতিক পরাজয় বলে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়।

।। ছয়।।

কাদের আলী সমাজের মূলস্রোতের মানুষ। কেননা সে সম্পদশালী পরিবারের সদস্য। অলস, অকর্মণ্য, উদ্ধত হলেও তার ভাতের অভাব নেই। তার চরিত্রের মূলভাবটি ওয়ালীউল্লাহ্‌ যেভাবে ধরতে চেয়েছেন, ‘...উগ্র - দুর্দান্ত স্বভাব বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা না হয়ে আরও তেজী হয়ে থাকে। কিছুদিন সে ইস্কুল করে, কিন্তু ইস্কুলের চার দেওয়ালের শক্তি কী তাকে দু-মিনিটের জন্যও কয়েদ করে রাখে।’

ফলে তারুণ্যের শেষে যুবা - কাদির, ‘বিছানায় যখন লম্বা হয়ে পড়ে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা, তখন খাটের খুরোতে আর তাতে তফাত থাকে না। মাছ - ধরার বাতিক জাগলে ছিপ - বড়শি নিয়ে পুকুর ধারে গিয়ে যখন বসে তখন প্রাত:কাল মধ্যদিনের উত্তাপ পেরিয়ে নিষ্প্রভ অপরাহ্নে গড়িয়ে যায়। সে নড়ে চড়ে না, নিস্পৃহ মুখ দেখে মনে হয় তার যেন কোন আশা - আকাঙ্খা নাই।’ আর তার চরিত্রের সবচেয়ে যে বৈশিষ্ট্য ওয়ালীউল্লাহ্‌ উল্লেখ করেন তা — ‘যুক্তিতর্কের সূত্র বেশিক্ষণ ধরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।’

এ হেন কাদের। সমাজে প্রতিষ্ঠা খুঁজে নেয় স্বপ্নাদৃষ্ট ‘দরবেশের’ ভূমিকায়। ‘দরবেশ’ অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেরিত ঐশীপুরুষ। কিন্তু কাদের মিঞার ‘দরবেশ’ পরিচয়ে ঐশ্বরিক আচ্ছন্নতা সর্বাংশে ইসলাম - চেতনার পরিপন্থী। কাদের মিঞার ‘দরবেশী’ লাভের বৃত্তান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠা খুঁজে পায় দাদাসাহেবের বিবৃতিতে অর্থাৎ এমন এক ব্যক্তি সংস্কারের আশ্রয়ে বয়ান দিচ্ছে, যার মধ্যে ইতিহাস চেতনা এবং আধুনিকতা দুটি ধারার মেলবন্ধন ঘটেছে।

দাদাসাহেব জানিয়ে দেন— ‘তখন সে অবিবাহিত। একদিন মধ্যরাতে সে জেগেই শুয়েছিলো, হঠাৎ বাড়ির

দেউড়ির কাছে থেকে কে - যেন ডাকলো। অপরিচিত কণ্ঠস্বর, তবু কোন বন্ধু যেন ডাকলো তাকে। ধড়মড়িয়ে উঠে দরজার খিল খুলে সে বেরিয়ে গেলো। কাউকে দেখতে পেলো না, কিন্তু তাতে নিরুৎসাহ হলো না, বিস্মিত হলো না, ভীতও হলো না। তারপর সে হাঁটতে থাকলো। অনির্দিষ্টভাবে নয়, কারণ কণ্ঠস্বরটি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো। সে-রাতে বুজুর্গের সঙ্গে তার প্রথমবার সাক্ষাৎ হয়। পরদিন সকালে যখন সে ঘরে ফেরে, তার মুখ ফ্যাকাশে, রক্তহীন, কিন্তু চোখে অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি, অলৌকিক তৃপ্তি-সন্তোষ ভাব। সেই থেকে বুজুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।'

লেখক কোথাও উল্লেখ করেন না, অথচ পাঠককে ইঙ্গিত দিয়ে বুঝিয়ে দেন এই অলৌকিক ধর্মানুভবের পিছনে সুপ্ত আছে অবৈধ যৌনতার একটি চোরাস্রোত। আসলে 'দরবেশ' বেশী কাদের মিঞার বুজুর্গের সঙ্গে রহস্যময় গোপনে সাক্ষাৎকারের পশ্চাতে থেকে যায়, একটি গ্রামীণ রমণীকে যৌন-উপভোগ করার আদিম বাসনা।

ঘটনাচক্রে কাদের মিঞার পরিবার আশ্রিত আরেফ আলী এক 'শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না রাতে,' যখন শেষ রাত্রির কুয়াশা নামে নি, তখন নৈশ - অভিসারী কাদের মিঞার পশ্চাৎধাবন করে একটি নির্মম হত্যার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। স্বল্পালোকিত বাঁশঝাড়ে 'সেখানে আলো - অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর অর্ধউলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়।' বোঝা যায়, কাদের মিঞা এই হত্যার নেপথ্যে নায়ক— হয়তবা আরেফ আলীর পদশব্দে সন্ত্রস্ত এবং ভীত হয়ে, সে রমণলিপ্ত নারীটিকে হত্যা করেছে অর্থাৎ কাদের মিঞা যেমন সরাসরি হত্যায় নিয়োজিত হয়, ঠিক তেমনি আরেফ আলী ঘটনা পরম্পরায় সরাসরি হত্যাকাণ্ডে নিয়োজিত দোসর হয়ে পড়ে। আরেফ আলীর নৈতিক অভিজ্ঞান, তাকে বাস্তবতা থেকে পালাতে দেয় না। বরং সে নানাভাবে যুক্তি দিয়ে কাদের মিঞাকে হত্যার দায়মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু যুক্তির অনিবার্য শাসনে, তার - স্বরচিত কল্প - পৃথিবীও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

আরেফ আলী কাদেরকে নিহত নারীটির 'প্রেমিক' রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে চায়। অথচ কাদের নিজেই সে ভাবনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। ফলে আরেফ আলী এই হত্যার পিছনে কোনো যুক্তিজাগর মানবিক সংবিত্তির খোঁজ পায় না। বরং অপরাধের চোরাবালিতে সে ক্রমশঃ তলিয়ে যেতে থাকে।

পরবর্তী সময় কাদের আরেফকে এই হত্যাকাণ্ডের সক্রিয় সহযোগিতে পরিণত করে। পরের রাত্রে আরেফের সাহায্য নিয়ে কাদের, নিহত নারীটির শবদেহ নদীস্রোতে ভাসিয়ে দেয়। এভাবে আরেফ আলী প্রথমে দর্শক, পরে তার সেই নিষ্ক্রিয়তা চ্যুত হয়। সে ঘাতের সক্রিয় সহযোগী হয়ে পড়ে।

কাদের মিঞা চায় আরেফ আলী ঘটনা থেকে নিজেকে অপসৃত করুক। আরেফ চায় ঘাতক এবং নিহতের মধ্যে একটি পার্থিব ভালবাসার জমি তৈরি হোক। অন্তত তাহলে সে এই হত্যানির্দেশের পশ্চাতে একটি যুক্তিসিদ্ধ প্রামাণিকতা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। বাস্তবে তা ঘটে না, ফলে আরেফ আলী প্রকৃতপক্ষে যুক্তির জমিতে দাঁড়ানোর কোনো অবলম্বন পায় না। ফলে তাকে আশ্রয় খুঁজতে হয় তার 'ধর্মবোধের' আবহে। 'সুরা'- ফালাক্' এবং সুরা লাহাব' অনর্গল পাঠ করেও সে শান্তি অথবা স্বস্তির খোঁজ পায় না। তখন তার শেষ আশ্রয় 'বড়বাড়ির দাদাসাহেব'। যদিও সে জানে 'দাদাসাহেব' অপরাধীকে কোনো দণ্ড দিতে সক্ষম নন। বরং দাদাসাহেবের কাছে তাঁর স্বীকারোক্তি তাকে আশ্রয়চ্যুত তো করবেই, এমন কী জীবিকাচ্যুতও করতে পারে। আরেফ আলীর শেষতম ভরসা রাষ্ট্রশক্তি। অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রবল ররুখে দাঁড়ানোর জন্য রাষ্ট্রও তাকে সাহায্য করে না। বরং রাষ্ট্র শক্তি তাকে স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নিতে বলে। আবার প্রমাণ হয় ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতার গোপন যোগসূত্রের বিভিন্ন সম্পর্কগুলি। রাষ্ট্র আরেফ আলীকে অপরাধীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করায়। পাঠক আবার ফিরে যেতে পারে, উপন্যাসের শুরুর দিকে, যেখানে মৃতের সঙ্গে জীবিতের কোনো পার্থক্য আমরা খুঁজে পাই না।

> 'গভীর রাতের বাঁশঝাড়ের মধ্যে আলুথালু বেশে মৃতের মত পড়ে থাকলেই মানুষ মৃত হয় না। জীবন্ত মানুষের পক্ষে অন্যের জীবন সম্পর্কে নিরাশ হওয়াও সহজ হয়। যুবক শিক্ষক কয়েক মুহূর্ত মৃত নারীর দিকে চেয়ে থাকে। তারপর একটা বেগময় আওয়াজ বুকে অসহনীয় চাপে আরো বেগময় হয়ে অবশেষে নীরবতা বিদীর্ণ করে নিষ্ক্রান্ত হয় হয়তো সে প্রশ্ন - করে কিছু, হয়তো কেবল একটা দুর্বোধ্য আওয়াজই করে: তার স্মরণ নাই। তবে এ-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ যে সে কোন উত্তর পায় নাই। মৃত মানুষ উত্তর দেয় না।'

।। সাত ।।

সমাজ যখন দায় গ্রহণে অপারগ, তখন ব্যক্তিকে দায়বদ্ধ হওয়ার জন্য সমাজের বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়। এই দায়িত্ব সচেতনতা মানবচৈতন্যের অস্তিত্বের প্রবল শিকড়। যা যে কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেও তার কর্মবৃত্তির আবহে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে রাখো। হবীবুল্লাহ্ বাহার সম্পর্কে একটি স্মৃতিচিহ্নিত গদ্যরচনায় ওয়ালীউল্লাহ্ লিখেছেন, 'আমরা যে ধর্মে বিশ্বাস করি, সে ধর্ম একটি ভৌগোলিক ক্ষুদ্রতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় সে-কথা উপলব্ধি করলে হয়তো একরকমের ক্লস্ট্রোফোবিয়ায় ভীতি থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, ধর্মের সার্বিক চরিত্রের মধ্যে গভীর তৃপ্তিলাভও হয় নিঃসন্দেহে। তবে সহধর্মী কিন্তু দূরদেশবাসী একটি সুদূর অতীতে যা করেছে তাতে গৌরব করার মধ্যে যে দৈন্যতাই প্রকাশ পায়, তা হাস্যকরও বটে।'

এই সার্বিক দীনতা ক্রমে ক্রমে ব্যক্তি - মানুষ থেকে সম্প্রদায়ে, সম্প্রদায় থেকে সমাজে, সমাজ থেকে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রনীতিতে ঘুণপোকা হয়ে বাসা বাঁধে। ফলে সর্বত্র এক ধরণের নিষ্ক্রিয়তা জেগে ওঠে। নিষ্ক্রিয়তা ব্যক্তিচৈতন্যে নৈরাজ্যের বীজ বপন করে। যে নৈরাজ্য ক্রমশঃ একটি সমাজকে বিপন্ন, অস্তিত্বহীন হয়ে যেতে বাধ্য করে।

ওয়ালীউল্লাহ্ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তির সদর্থকতায়। মহাবিশ্বের সর্বত্র যে-ব্যাপ্ত প্রাণকণা এবং বস্তুপুঞ্জ— আমরা যতক্ষণ না তাদের ভিতর কোনো অর্থ আরোপ করছি, তাদের মধ্যে থেকে এক অনুভাব বিশ্লেষিত করছি— ততক্ষণ সেই ব্যক্তি অথবা বস্তু নিছক জড়, নিরর্থ হয়ে তাকে। অর্থশূন্য মানুষ এবং বস্তুকে অর্থসম্পন্ন করে গভীর ব্যঞ্জনা দান করে মানবিক কর্মস্পৃহা, তথা আকাঙ্ক্ষা। এই কর্ম - অনুগতি মানুষকে 'মানুষ' করে তোলে— তার স্বাধীন সত্তা এবং চিন্তা শক্তিকে বিকশিত করে।

আরেফ আলীর ঘটনার আবর্তে জড়িত হওয়া, ঘটনার কেন্দ্র থেকে সরে না আসা, সত্যের দিকে যুক্তিজাগর অভিযাত্রা সবকিছু তার অস্তিত্বের চরম নিয়ামক। সমগ্র ভীরুতাকে দীর্ণ করে যখন আরেফ আলী 'সত্যের কাছে পৌঁছে যায়'— হয়ত তখন তাকে 'ক্ষমতার' উৎসবিন্দুগুলি নিষ্পেষিত করা, ছিন্ন করার সুযোগ পেয়ে যায়— কিন্তু তার অনড়-নিস্পৃহতা, সত্যের প্রতি অনুরাগ— মানবসত্তার এক সুগভীর আত্মিক মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করে।

।। আট ।।

চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে বর্ণিত আখ্যানে আমরা সমান্তরাল দুটি স্তর দেখতে পাচ্ছি। একটি কেন্দ্রীয় বহির্বাস্তব, অন্যটি বিষয়ীভূত অন্তর্বাস্তব। বহির্বাস্তবে ব্যক্তির অস্তিত্বের সংকট চিত্রিত, অন্তর্বাস্তবে রয়েছে সমষ্টির দীর্ণ বিয়োগ বেদনা। ব্যক্তি এবং সমষ্টিকে একীভূত করে গড়ে উঠেছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ে— সময় থেকে অগ্রগমণ থেকে, ক্রমউন্নয়ন থেকে বিযুক্তির ছিন্ন শির বাস্তবতা। রাষ্ট্র এবং সমাজ যখন ব্যক্তিকে লালন করে না, আশ্রয় দেয় না, বিপরীতে প্রত্যাখান - তৎপর ব্যক্তিগত উদ্যমকে গলা টিপে চুপ করিয়ে দিতে চায়। যাবতীয় সততা এবং নীতিগত ঐশ্বর্যকে যে সমাজ অস্বীকার করে, সেই সমাজ যে বাস্তবতার অভিঘাতও সহ্য করতে পারে না, এই রূঢ় সত্য ওয়ালীউল্লাহ্ স্বঅভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন। সেই অকৃত্রিম অভিজ্ঞতার নির্যাস, তাঁর তিনটি উপন্যাস, বিশেষত 'চাঁদের অমাবস্যা' —তার সৃষ্টির নির্মাণগত উৎকৃষ্টতায়, শিল্পের যে উচ্চতাকে স্পর্শ করেছে তার তুলনা বাংলাসাহিত্য খুব বেশি নেই।

সমাজ এবং স্বজনহীন আরেফ আলী। তার দেশ নেই, কাল নেই, অতীতের অভিজ্ঞান নেই, বর্তমানের দৃঢ়তা নেই। ভবিষ্যতের উদ্যম নেই। সে একা, মহাবিশ্বে নির্জন দ্বীপবাসী পরিত্যক্ত মানুষের মত নিঃসঙ্গ। শিক্ষা এবং অধ্যাত্মচেতনা তার সামনে কোনো উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করেনি। অথচ তাকে এমন এক সমাজে বসবাস করতে হয়, যে সমাজে মানুষের অবস্থান চিহ্নিত করে বিত্তকৌলিন্যে। যে সমাজে — সত্যের কঠিন পরিচয় মিথ্যার কুয়াশার বারবার ঢাকা পড়ে। যদি কেউ সে কুয়াশা সরাতে চায় তাহলে অস্তিত্বের ডালপালাসহ সে ভেঙে পড়ে নিজেই কুয়াশার বিস্মৃতিতে চাপা পড়ে যায়।

ওয়ালীউল্লাহ্ লিখেছেন, 'মৃত মানুষ উত্তর দেয় না'—কিন্তু তিনি জানতেন, মৃত মানুষের নীরবতা কখনো সত্যের প্রবল মুখাবয়ব হয়ে ওঠে। সে কঠিন সত্য থেকে যখন কোনো জাতি, গোষ্ঠী কিংবা সম্প্রদায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চায়, তখন বাস্তবের পৃথিবীতে তাদের মাটি চেপে দাঁড়ানোর মতো একইঞ্চি জায়গা থাকে না। ফলে চার দশক অতিক্রম করেও, ওই উপন্যাসের বিষয়ানুগ প্রাসঙ্গিকতা এখনো সময়ের কুটিল আবর্তে হারিয়ে যায় নি। দেয়ালের পিঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আরেফ আলীরা এখনো সমাজের অচলায়তনে— কখন যেন একটি ছোট্ট, অনিবার্য, ধ্বংসপ্রবণ চিড় ধরিয়ে দিয়ে যায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য - আনিসুজ্জামান

২. কোরআন শরীফ — ভাই গিরীশচন্দ্র সেন অনুবাদিত

৩. উপন্যাস সমগ্র — সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, নয়া উদ্যোগ সংস্করণ

৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ম — আবদুল মান্নান সৈয়দ

৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম — জিনাত ইমতিয়াজ আলি

৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ের জীবন ও সাহিত্য — সৈয়দ আবুল মকসুদ্

৭. উচ্চশিক্ষা ও বঙ্গীয় মুসলমান — মোহম্মদ তামসিরউদ্দিন / পল্লীশিক্ষক বৈশাখ ১৯৩৩

৮. মক্তব - মাদ্রাসার বাংলা ভাষা — রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/ মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৪১.

৯. শিক্ষার ভিত্তি — শেখ আবদুর রহমান / আল এসলাম, কার্ত্তিক ও অগ্রাহায়ন, ১৯২৬

১০. British Policy and Muslims of Bengal - A.R. Mallick (1961)

১১. The Origin of Musalmans of Bengal - K. F. Rubbi (1895)